আমি সূর্যসেনের সহযোদ্ধা

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী

শুধু ১৯৩০ থেকে নয়, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারে সময় থেকে। আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময়। সেই সময়ে আমাদের চট্টগামেও বীর সিপাহী রজব আলী প্রাণ দিয়েছিল। তারপর থেকে নানা আন্দোলন চলে আসছে। এর মধ্যে ১৯২০ সালে প্রায় ২০ হাজার চা-বাগানের কুলি কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে এসে সমবেত হয়। ইংরেজ সরকার এ বিদ্রোহ দমনে চাঁদপুরে একটি পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই বর্বরতার প্রতিবাদ করে পুরো ভারতবর্ষ। এরকম আরো অনেকগুলো হত্যাযজ্ঞ চালায় ব্রিটিশরা। এরকম পরিস্থিতিতে মহাত্মাগান্ধী ১৯২০-২১ সালে সত্যাগ্রাহক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এভাবে ২১, ২২, ২৩ সাল চলে গেল। এসব আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ সরকার একটু চাপের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তাদের শোষণ আর অত্যাচার একটুও কমায়নি। এদিকে বিপ্লবীরা মনে করত সশস্ত্র উপায়েই বর্বর, অত্যাচারী, নিপীড়নকারী, নির্যাতনকরী ব্রিটিশ শাসন-শোষণকে এই দেশ থেকে তাড়াতে হবে। তাই ১৯০৫ সালে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য একটা সভা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার তৃমীতের সভাপতিত্বে সেই সভা হয়েছিল এবং সেটা অনুশীলন সমিতি নামে পরিচিত। তারপর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে সেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। আমাদের চট্টগ্রামেও মস্টারদা সূর্যসেন, আমাদের দাদা অনুরূপ সেন, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী দল

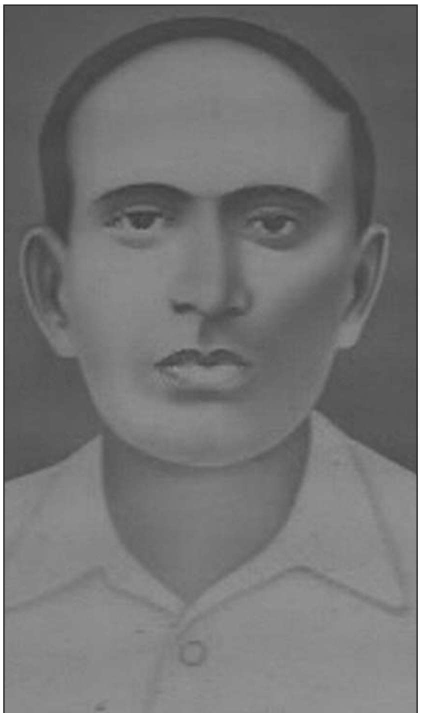

mh †mb

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী

গড়ে ওঠে। আমরা তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়াতে লাগালাম। অল্পদিনেই শত শত তরুণকে আমরা পেয়ে গেলাম যারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। আমরা দেওয়ানজি পুকুরপারে ‘শান্তি আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। ওখানেই গোপন সভা করতাম।

এই আন্দোলন সংঘটিত করতে গিয়ে ১৯২৪ সালে মস্টারদা এবং অন্যান্য নেতা ব্রিটিশের রোষানলে পড়েন। মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং ও গণেশকে বন্দি করে

কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিছু দিন পর এরা বিচারে ছাড়া পায় কিন্তু তাদের মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' আইনে আটক করা হয়। তবে ১৯২৮ সালে করাগার থেকে সবাই ফিরে আসেন। জেল থেকে ফিরেই মাস্টারদাসহ আমাদের নেতারা প্রকাশ্যে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরের বছরই মাস্টারদা চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। সভাপতি হন মহিম চন্দ্র দাশ। সে সময় জাতীয় পর্যায়ে ভারতীয় কংগ্রেস মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে নরমপন্থি ও নেতাজি সুবাসচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবীপন্থি দু'টি ধারায় পরিচালিত হচ্ছিল। মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কংগ্রেস ছিল সুবাষপন্থি। যদিও ছোট একটি অংশ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে নেহেরুর নরম পন্থার সমর্থক ছিল। মাস্টারদাসহ আমাদের কংগ্রেসে যোগদান বা দলের কর্মকান্ডে যোগ দেয়াটা ছিল কৌশলগত। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন যাতে পুলিশ ও ব্রিটিশদের চোখের আড়ালে থাকে সে জন্যই এটা করা হয়েছিল।

সে যাই হোক, জেল থেকে ফিরেই আবার বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত করার কাজে লেগে পড়েন মাস্টারদাসহ সবাই। মাস্টারদা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির মতো আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের নাম রাখেন 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' এবং অন্তত চট্টগ্রামকে স্বাধীন করার জন্য তিনি একটা কর্মসূচি নেন। সেই কর্মসূচি বস্তবায়ন হয় ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের দিনে। সেই দিন মাস্টারদা ১০০ জন তরুণ যুবককে নিয়ে একটা কর্মসূচি নেন। সেই কর্মসূচি হলো 'ডেথ প্রোগ্রাম' (মৃত্যু কর্মসূচি)। ঠিক করা হলো চট্টগ্রামের ক্ষমতা দখল করবো, চট্টগ্রামকে স্বাধীন করব এবং আমরা এই ১০০ জন যুবক মাস্টারদার নেতৃতে ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম করে সবাই মৃত্যুবরণ করব। ক্ষমতা দখল এবং মৃত্যুবরণ। আমরা জনি আমাদের এই মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। কিন্তু আমরা মরে মরে দেশকে জাগাবো। আমাদের এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত দেশ, নির্জীব দেশ, পরাজয়ের শৃঙ্খলে যারা তাদের অধীকার বোধ হারিয়েছিল সেই দেশবাসী জেগে উঠবে। তাদের জাগাবার জন্যই তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্যই আমরা মরব। এই হলো ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের মাস্টারদার 'ডেথ প্রোগ্রাম'।

এই কর্মসূচির আওতায় ঠিক করা হলো পুরো চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের যে ঘাটিগুলো আছে তা সব দখল করবো। পরিকল্পনা মতো ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল আমরা সব একের পর এক দখল করেছিলাম। আমাদের প্রথম দলটি অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে নন্দন কাননে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল করে জ্বালিয়ে দেই। নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে আরোকটি দল রাত দশটা নাগাদ পাহাড়তলিস্ত রেলওয়ের অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। কিছু অস্ত্র নিয়ে বাকি সব ভেঙে ফেলা হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায়

প্রীতিলতা

আমরা রেললাইন উৎপাটন করেছিলাম। সব শেষে দখল করি দামপাড়া পুলিশ লাইন। আমাদের ক্ষিপ্র আক্রমণ ও গগণবিদারী স্লোগানে ওরা পালিয়ে যায়। পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারে তখন যত সব অস্ত্র ছিল আমরা সব দখল করলাম। অক্সিলিয়ারি ফোর্স যেখানে সব স্টেজের আর্মস থাকে এস্টেনগান, রিভলবার, মেশিনগান, রুইসগান থাকে সব অস্ত্র আমরা দখল করেছিলাম। এভাবে চট্টগ্রামের ক্ষমতা আমরা আমাদের হাতে নিয়ে নিলাম। মাস্টারদাকে আমরা রিপাবলিকান আর্মি অব চিটাগাং ব্রাঞ্চের সভাপতি পদে বৃত করেছিলাম। তার হাত দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলাম। আমাদের নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং প্রমূখ যারা অস্ত্র চালনা জানত না তাদের রাইফেল চালনা শিখালেন। তার কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে ছিলাম, তখন তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট পোর্টে নোঙর করা বিদেশী জাহাজ থেকে একটা মেশিনগান নিয়ে এসে পুলিশ লাইনের নিকটে একটি দোতলা বাড়ি ছিল, বাড়িটি এখনো আছে, ওটাই ছিল তখন একমাত্র দোতলা বাড়ি, সেই বাড়ির ছাদ থেকে আমাদের ওপর মেশিনগানের হামলা শুরু করল। আমরা অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে পড়লাম।

মাস্টারদা আমাদের নেতা লোকনাথ বলকে আদেশ দিলেন, তুমি এটা প্রতিরোধ কর। লোকনাথ বল আমাদের ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন 'Lay down and begging fire', আমরাও সবাই 'বন্দেমাতরাম' বলে শুয়ে পড়ে রাইফেল ফায়ার করতে লাগলাম। এ রাইফেল আমাদের ছিল না, এই রাইফেলগুলো আমরা ঐ দামপাড়া পুলিশ লাইন থেকে হস্তগত করেছিলাম। হাজার হাজার রাইফেল ছিল, আমরা যে ৬০-৭০ জন ছিলাম প্রত্যেকে একটি করে রাইফেল নিলাম। বাকি রাইফেগুলো আমরা ভেঙেচুরে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তখন রাত ১২টা কি ১টা। আমাদের সেই আক্রমণে, আমাদের সেই স্লোগানে, সেই গগনবিদারী

লোকনাথ বল

স্লোগানে মনে হয়েছে আমরা অনেক, অনেক, অনেক লোক আছি। ভয় পেয়ে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। ঘন্টাখানেক পরে তারা আবার আসে, আবার সে দামপাড়া পুলিশ লাইনে মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করতে আরম্ভ করে। আমরা রাইফেল ফায়ার করে তাদের হামলার জবাব দিচ্ছিলাম। তাদের মেশিনগানের রাইফেলের গুলি অনেক দূর যায়, আমাদের রাইফেলের গুলি অতদূর যায় না। আমরা রাইফেল চালচ্ছি বটে, আমরা জানি যে আমাদের রাইফেলের গুলি ওদের গায়ে লাগবে না। তবুও আমরা গুলি চালাচ্ছিলাম। তার পর আবার তারা পালিয়ে গেল। তখন মাস্টারদা, নির্মলদা, অমৃতদা, লোকদা সবাই মিলে (আমাদের নেতারা মিলে) এতটা স্থির করল যে, আমরা আপাতত এই অরক্ষিত স্থান থেকে একটু পাহাড়ের দিকে চলে যাব।

দুর্ভাগ্যবশত এই অস্ত্রাগারে আগুন দেওয়ার সময় আমাদের একজন ছেলে মারা গিয়েছিল। তার নাম ছিল হিমাংশু সেন। তাকে রেখে আসার জন্য গণেশ ঘোষ GOC (General officer commanding), অনন্তশীল commanding ছিল, তারা দু'জন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল শহরের ভেতরে। তাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম, তারা ফিরলেই দামপাড়া পুলিশ লাইন ছেড়ে পাহাড়ে চলে যাব। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে না আসায় আমরা মাস্টারদার নির্দেশে পাহাড়ে যাব মনস্থির করলাম। আমরা পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম এবং এরপর ১৮ তারিখ রাতে ১৯ তারিখ, ২০ তারিখ, ২১ তারিখ সকাল পর্যন্ত আমাদের ঐ জেনারেলদের খোঁজে শহরে লোক পাঠিয়েছি, কিন্তু তাদের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। তখন ২১ তারিখ সন্ধ্যায় মাস্টারদা স্থীর করলেন আমরা ফতেহাবাদ পাহাড়ের যে জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম ঐ জায়গা ত্যাগ করবো এবং আবার শহরে আক্রমণ করবো। সেখান থেকে চলে এসে শহরের তিন-চার জায়গা দিয়ে আবার আক্রমণ

করব। আমাদের আগের যে প্রোগ্রাম 'To die to the last man' আমরা সেই প্রোগ্রামটা বাস্তবায়ন করবো।

সেই পরিকল্পনা মতো আমরা ফতেহবাদ পাহাড় ত্যাগ করে আসছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ২২ তারিখ আমরা জালালাবাদ পাহাড়ের কাছাকাছি এসেছি, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। চাষীরা গরু, লাঙ্গল-জোয়াল নিয়ে বেরিয়েছে মাঠে হালচাষ করার জন্য। তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছিল। এই জন্য তাড়াতাড়ি ঠিক হলো দিনের বেলা শহর আক্রমণ ঠিক হবে না। আমরা আজকে এ জালালাবাদ পাহাড়ে থাকব। তারপর আমরা রাতে আক্রমণ করব।

কিন্তু ঐ যে চাষীরা আমাদের দেখল, এই খবর ব্রিটিশের কাছে গেল, আর্মির কাছে গেল, পুলিশের কাছে গেল যে, একদল সশস্ত্র যুবক এই পাহাড়ে আছে। আর্মি ও পুলিশ বিকেল সাড়ে চারটার সময় এসে পাহাড় ঘিরে ফেলল। ওখানে আমাদের সঙ্গে তাদের প্রায় দু'ঘন্টা যুদ্ধ হলো। এর পরে তারা পলায়ন করল। তারা মনে করল আমরা অনেক বেশি, তারা আমাদের সঙ্গে পারবে না, তারা আবার পালিয়ে গেল। কিন্তু এই জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি করলো। আমাদের ১১ জন সৈন্য মারা গেল। এবং একজন পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল। প্রথমে শহীদ হন হরিগোপাল বল, তারপর একে একে ত্রিপুরা সেন, নরেশ সেন, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাষ বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেন্দু দস্তিদার, জিতেন দাশ, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো। এই যুদ্ধে আমি নিজে আহত হয়েছিলাম। আমাদের নেতা অমৃত চক্রবর্তী আহত হয়েছিলেন। এবং আরো দু-একজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলেন। আমরা এর আগে তিন দিন পর্যন্ত প্রায় অনাহারে ছিলাম। তারপর আমরা ছিলাম যুদ্ধবিদ্যায় একদমই আনারি। অনেকেই ছিল একদম বালক বয়সী। এরকম একটি দলের কাছে ব্রিটিশের বাছাই করা সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে হেরে পালালো। তারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল এবং তাদের অস্ত্রও ছিল আমাদের তুলনায় শক্তিশালী। শুনেছি ওদের হতাহতই হয়েছিল সত্তর-আশি জনের মতো। এই হলো জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ।

যাই হোক, ওরা পালিয়ে যাবার পর আবার সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা এই পাহাড় ত্যাগ করে চলে যাব এবং আর ওদের সঙ্গে Open fight (সম্মুখযুদ্ধ) চলবে না। এখন আমরা গেরিলা যুদ্ধ করব। আমরা অজ্ঞাতবাসে যাব এবং বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আমরা যাব ও গেরিলা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখব। এরপর মাস্টারদা, আমি এবং আমাদের আরও নেতারা অনেকেই পলাতক জীবনে ছিলাম। ২৪ এপ্রিল মাস্টারদা গোপনে তার নিজ বড়িতে যান, তার সঙ্গে ১৬ জন বিপ্লবী ছিল। ৬-৭ দিন অভুক্ত থাকার পর আলুসিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েন। এর মধ্যে ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে ধরার জন্য ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। সে সময় ১৫ হাজার অনেক টাকা। গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আমরা ছড়িয়ে পড়ি। তার পর ৬ মে কালারপোলে আমাদের একটি গ্রুপের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়। এতে স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন ও মনোরঞ্জন সেন শহীদ হন।

আমাদের লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জীবন দেব। পরাক্রমশালী ব্রিটিশ অপশক্তির বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে প্রতিবাদ করব। আমাদের আত্মদান দেখে দেশের মানুষ ওদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরো প্রতিবাদী হবে। এভাবে ক্রমশ ভারতবর্ষ জেগে উঠলে সাম্রাজ্যবাদের বিদায় হবে এ দেশ থেকে। নিপীড়িত দেশবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। এটাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আমাদের সে লক্ষ্য অনেকখানি অর্জিত হয়েছিল। মানুষ ক্রমশ আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকলো। ব্রিটিশ দখলদারিত্বে একটা কাঁপন আমরা ধরাতে পেরেছিলাম

পলাতক জীবনে অনেকগুলো কাজ করেছিলাম। যেমন- ঢাকার মেজিস্ট্রেটকে গুলি করে আহত করা, কুমিল্লার এসপি এডিসনকে হত্যা করা, পুলিশের আইজি হেগকে গুলি করে মারার জন্য আমরা রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তীকে চাঁদপুর পাঠিয়েছিলাম। সেখানে হেগের যে দেহরক্ষী ছিল তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তারও চেহারাটা একেবারে সাহেবের মতো ছিল। ভুল করে তাকেই হত্যা করা হয়েছিল। চট্টগ্রামে কুখ্যাত একজন ডেপুটি এসপি ছিল, সে ছেলেদের নানাভাবে অত্যাচার করত। ছেলেদের মা-বাবাকে পর্যন্ত অত্যাচার করত। নিজে প্রস্রাব করে ছেলেদের এমনকি মা-বাবাদেরও খাইয়ে দিত। তাকেও আমরা গুলি করে হত্যা করেছিলাম। এ রকম অনেক কাজ সে সময় করেছি।

এভাবে গোপনে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন চলতে থাকলো। আমাদের লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জীবন দেব। পরাক্রমশালী ব্রিটিশ অপশক্তির বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে প্রতিবাদ করব। আমাদের আত্মদান দেখে দেশের মানুষ ওদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আরো প্রতিবাদী হবে। এভাবে ক্রমশ ভারতবর্ষ জেগে উঠলে সাম্রাজ্যবাদের বিদায় হবে এ দেশ থেকে। নিপীড়িত দেশবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। এটাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আমাদের সে লক্ষ্য অনেকখানি অর্জিত হয়েছিল। মানুষ ক্রমশ আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকলো। ব্রিটিশ দখলদারিত্বে একটা কাঁপন আমরা ধরাতে পেরেছিলাম। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাটে সাবিত্রীর বাড়িতে মাস্টারদার উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশ আক্রমণ চালায়। এতে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদ হন। পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করে দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পর মাস্টারদা কাজটি মহিলা বিপ্লবীদের দিয়ে করাতে স্থির করেন। সেভাবে প্রীতিলতাকে নির্দেশও দেন। প্রীতিলতার নেতৃত্বে গঠিত দলে আরো ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে, সুশীল দে, প্রফুল্ল দাস ও মহেন্দ্র চৌধুরী। ২৩ সেপ্টম্বর নাচ-গান ও পানের আসরে ক্লাব যখন জমজমাট, তখন বিপ্লবীরা আক্রমণ চালায়। প্রীতিলতা নিজে দৌড়ে সামনের দরজায় বোমা হামলা করেন। এক পর্যায়ে তার হাতে গুলি লাগে। এর মধ্যে বিপ্লবীরা এক ইংরেজকে হত্যা করেন। আর্মির গাড়ি আসতে দেখে প্রীতিলতার নির্দেশে বিপ্লবীরা পশ্চাৎপসারণ করে। সবাই নিরাপদে ফিরেছে নিশ্চিত হয়ে আহত প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পঠিয়ার গৈড়লা গ্রাম থেকে মাস্টারদা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। নেত্র সেন নামে এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দেয়। ১৮ মে ধরা পড়েন তারকেশ্বর দস্তিদার এবং কল্পনা সেন, রাউজানের এক গ্রাম থেকে। আমাদের অনেকেই আস্তে আস্তে ধরা পড়েছিল। অনেকের ফাঁসি হলো। ১৯৩৩ সালে প্রথম আমাদের মধ্যে কৃষ্ণা চৌধুরীসহ তিনজনের ফাঁসি হয়। পরের বছর ১৯৩৪ সালে মস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। এর পর আস্তে আস্তে আমাদের অনেক নেতা=কর্মী গ্রেপ্তার হয়। এবং চট্টগ্রামের শত শত ছেলেকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা হয় বছরের পর বছর।

তখনো আমাদের ভরতবর্ষ জুড়ে মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিভন্ন আন্দোলন চলছিল। প্রথমে সে আন্দোলনের নাম ছিল লবণ সত্যাগ্রহ। আমাদের লবণ তৈরি করতে দেয়নাই ইংরেজরা। আমাদের চারদিকে লবণ সমুদ্র, সেই জল আমারা সিদ্ধ করে লবণ তৈরি করতে পারি কিন্তু দেয়নি। কাজেই বললেন আমরা লবণ তৈরি করব। বাংলাদেশে হাজার লক্ষ্য লোক লেগে গিয়েছি লবণ তৈরিতে। আমাদের এই আন্দোলনের এবং ১৯৩৩ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এভাবে ১৯৪২ সালের ভরত ছাড় আন্দোলন সংঘটিত হয়।

সে সময় নেতাজি সুবাষচন্দ্র বসু জেলে ছিলেন, অসুস্থতার বাহানা করায় তাকে জেল থেকে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। সেই বাড়ি থেকে তিনি পালিয়ে জার্মানি চলে যান। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। পুরো পৃথিবী উত্তাল। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিশ্ব। একদিকে আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটিশদের নেতৃত্বে মিত্রপক্ষ; অপরদিকে হিটলারের জার্মানি ও জাপান। জার্মানরা নেতাজিকে সাবমেরিনে (ডুবো যুদ্ধ জাহাজ) করে জাপান পাঠায়। কারণ যুদ্ধ চলায় বিমানে পাঠানো সম্ভব ছিল না। সাধারণ সিভিলিয়ন হিসেবে সাবমেরিনে তার মৃত্যু ঝুঁকি ছিল। কিন্তু তিনি দেশের জন্য সে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। জাপানে বসে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের এই সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন । এর পর তারা বাদ্য হয় আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আরো অনেক পরে।

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে আমাদের আর এই উপমহাদেশে রাজত্ব করা চলবে না। তারা ষড়যন্ত্র করে কিছু লোকের সহায়তায় এ দেশকে বিভক্ত করে দেয়। একটা হলো পাকিস্তান আরেকটা ভারত। আমরা পাকিস্তানে পড়েছিলাম। পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটো প্রদেশ। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে। ব্রিটিশদের মতোই পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান শাসন-শোষণ করতে থাকলো। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকারের কোন স্বাধীনতা নেই। আমাদের একমাত্র পোর্ট চট্টগ্রাম থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হতো কিন্তু সমস্ত টাকা চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। আয় করে পূর্ব পাকিস্তান, উন্নায়ন হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। একবার করাচি রাজধানী হয় আবার রাওয়ালপিন্ডি হয়। এই রকম করে তারা করছিল। কিন্তু আমরা যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই। আমাদের দেশের মানুষ যেই গরিব সেই গরিবই রয়ে গেল, ওখানের লোক ধনী হতে লাগলো। এবং শেষ প্রর্যন্ত যখন জিন্নাহ সাহেব বললেন, urdu is only state languish of Pakistan (উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা)। আমরা বললাম যে, না পুরো পাকিস্তানের ৫৪ শতাংশ লোক আমরা বাংলাভাষী, আর ৪৬ শতাংশ লোক হল উর্দুভাষী। তাও উর্দুভাষী না, কিছু কিছু সিন্তানি কথা বলে, কিছু বেলুচি ভাষায় বা হিন্দি কথা বলে। লাহোরে শুধু উর্দু ভাষা। উর্দু ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে এটা বাংলার ছেলেরা মানলো না। অর্থাৎ বাংলার স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছেলেরা মানলো না। তারা বলল, বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হবে। সেই সময় করাচিতে গণপরিষদ অধিবিশনে আমাদের কংগ্রেস নেতা ধিরেণ চন্দ্রনাথ দত্ত, মুফিন্দ্রনাত দত্ত, শীষচন্দ্র চ্যাটার্জি তারাও সেখানে বললেন উর্দু ও বাংলা দুটোই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। একটা রাষ্ট্রভাষা চলবে না, তারাও

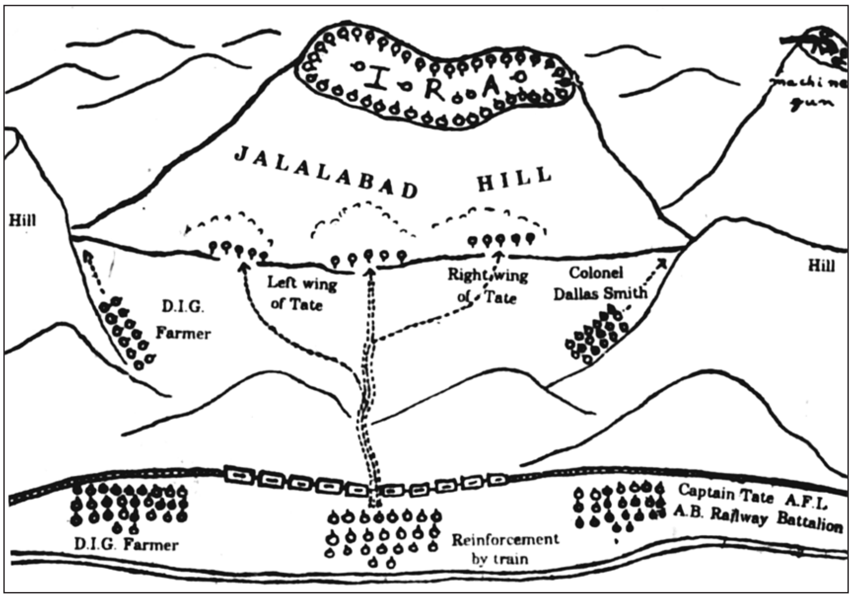

জালালাবাদ যুদ্ধের মানচিত্র

সেখানে আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আন্দোলোন আরম্ভ করতে লাগলো। যখন ঢাকায় আবার নাজিমুদ্দীন সাহেব বললেন উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা, তখন ছেলেরা, বলল আমরা এর প্রতিরোধ করব। সেই প্রতিরোধ করার জন্য তারা ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারি একটা শোভাযাত্রা বের করার কথা বলেছিল। তখন পাক সরকার সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। পুলিশ বলছে, মিছিল করা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছেলেরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সেই শোভাযাত্রা বের করেছিল। পাক সরকারের নির্দেশে সেদিন সেই নিরীহ নিরস্ত্র ছেলেদের মিছিলে নির্বিচারে গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করেছিল।

সেই হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়েই আবার দেশের ভিতরে একটা জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের আবারও নিঃস্ব করছে, শেষ করে দিচ্ছে। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না, তারা তাদের কথাই ভাবছে। সেই জন্য ৬ দফা আন্দোলন শুরু করলেন। এবং সমস্ত দেশকে জাগাতে আরম্ভ করলেন। এই ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, সেই ৬ দফা আন্দোলন আস্তে আস্তে তিব্র থেকে তিব্রতর হতে লাগল, তখন ১৯৭০ সালে একটা নির্বাচন দিল ইয়াহিয়া খান। সেই নির্বাচনে দেখা গেল তারা বাংলাদেশে একটা সিটও পেল না। আওয়ামী লীগ সব সিট পেয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স যেখানে সীমান্ত গান্ধীর দল কতগুলো সিট পেয়েছে, সেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

তখন পশ্চিম পাকিস্তানের দল... ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি মাইনোরিটি হয়ে গেছে। আইন অনুযায়ী যে দল অধিকসংখক আসন পায় সেই দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী হয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু মুজিবকে তারা কিছুতেই প্রধানমন্ত্রী করবে না। নানা রকম তালবাহানা করতে লাগল। ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকায় এল। তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করলো। আলোচনার নাম করে সময় ক্ষেপন করলো, এর মধ্যে অনেক সৈন্য-সামন্ত এনে জড়ো করলো পূর্ব পাকিস্তানে। এবং ২৫ মার্চ নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবগুলো ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য যেখানে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি আছে সেখানে নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগল। বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে এনে খুন করলো, যাতে বাঙালিদের মেধাশূন্য করে দেয়া যায়। এই থেকেই মুক্তযুদ্ধের সূচনা। শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিলেন যে, 'আমাদের এই যুদ্ধ মুক্তির সংগ্রাম, তোমরা যে যা পার হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ কর।' তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। আমাদের অন্য নেতারা তাজউদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে প্রায় এক কোটি লোক ভরতে চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তারা যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হলো আর তাদের ভারত সরকার নানাভাবে সাহায্য করল। এ পর্যায়ে একটা বোকার কাজ করল পাকিস্তান, তারা সেই সময় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল । তখন ভারতই সুযোগ পেল পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য পাঠানোর। ভারতীয় সৈন্যের আক্রমণে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে আমরা মহাসাফাল্যে স্বাধীন হয়ে গেলাম। এই হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নুতন দেশ গঠিত হলো, সেটা হলো আমাদের বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ।

গ্রন্থনা : **বদরুল আলম নাবিল**
সাইফ ইসলাম